বিশেষ সংখ্যা

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

আগস্ট ২০১৯ • বর্ষ-৫

ডেঙ্গুর ভয়াবহতা

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

আগস্ট ২০১৯ ● বর্ষ-৫

প্রত্যয়

জনসচেতনতার লক্ষ্যে ডেঙ্গু বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদক
প্রাণেশ বণিক

সহযোগী সম্পাদক
নজরুল ইসলাম
এসএমএ রকিব
নার্গিস মোর্শেদ
আশরাফুল আলম খোশনবীশ

লেখা পাঠান

- কর্মসূচি সংক্রান্ত
- বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা
- সফলতার গল্প
- সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি
- নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা এবং
- তথ্য বহুল লেখা

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ

khoshnobish@burobd.org
০১৭৩৩ ২২০৯০০
nargis@burobd.org
০১৭৩৩ ২২০৮৫৪

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৫৫০৫৯৮৬০, ৫৫০৫৯৮৬১, ৫৫০৫৯৮৬২
ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org

এ সংখ্যায় থাকছে

সূচীপত্র

০৩
মশা পৃথিবীর প্রধান প্রাণঘাতী প্রাণী!

০৬
ডেঙ্গু জ্বর, লক্ষণ ও প্রতিকার

০৮
এডিস মশার কামড় থেকে বাঁচতে

০৯
ডেঙ্গু জ্বর: রোগীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

১০
ডেঙ্গু জ্বরের পর করণীয়

১১
আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই

১২
গর্ভাবস্থায় ডেঙ্গু হলে কী করবেন

১৩
ডেঙ্গু জ্বর কাদের সবচেয়ে বেশি হয়? জেনে নিন করণীয়

১৪
ডেঙ্গু ভাইরাস: যেভাবে শনাক্ত করা হয়

১৫
এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে করণীয়

১৬
মোবাইলেই মিলবে রক্তের খোঁজ

মশা পৃথিবীর প্রধান প্রাণঘাতী প্রাণী!

একটি পুরোনো প্রবাদ আছে, 'আপনি যদি ভাবেন যে, আপনি অন্যের তুলনায় খুব ছোট; তবে একটি মশার সঙ্গে রাত কাটানোর চেষ্টা করুন।' অর্থাৎ সামান্য মশার সঙ্গে ঘুমালে তার অত্যাচারে আপনি অতিষ্ঠ হয়ে বুঝতে পারবেন ছোট জিনিসও কত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মশাদের ডানার গুঞ্জন, জ্বালাময় কামড় এবং প্রায় সর্বব্যাপী উপস্থিতি যদিও একটা সাধারণ উৎকণ্ঠার বিষয় তবে সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো, মশার বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা। এ প্রাণীটি মানব ইতিহাসের মারাত্মক সব ক্ষতিকারক রোগ শুধু বহনই করে না, একই সঙ্গে ক্যারিয়ার বা ভেক্টর হিসেবে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বব্যাপী।

প্রতি বছর প্রায় ৭ লাখ মানুষ মশাবাহিত রোগে মারা যাচ্ছে; যেজন্য মশা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাণঘাতী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু জ্বর, চিকুনগুনিয়া ও জিকার মতো মশাবাহিত রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গত ৩০ বছরে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার ৩০ গুণ বেড়েছে এবং তা প্রায় ১০০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

জানামতে, পৃথিবীতে ৩ হাজারের বেশি প্রজাতির মশা রয়েছে; যদিও মাত্র তিন ধরনের মশা মানুষের মধ্যে রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী। এনোফিলিস মশা একমাত্র প্রজাতি, যা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে।

কিউলেক্স জাতীয় মশারা ওয়েস্টনাইল ভাইরাস, জাপানিজ এনসেফালিটিস ভাইরাস, সেন্ট লুই এনসেফালিটিস ভাইরাস এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফাইলেরিয়াসিস ও এভিয়ান ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে।

তৃতীয় প্রজাতির মশা, যারা 'এডিস' বা 'টাইগার মসকিউটো' নামে পরিচিত; ইয়েলো ফিভার, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জাপানিজ এনসেফালাইটিস ভাইরাস বহন করে।

এডিস দ্বারা সংক্রমিত এ ভাইরাসগুলোর মধ্যে ইয়েলো ফিভার রোগটি ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত।

পশ্চিম আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত এ রোগটি ক্রীতদাস ব্যবসার সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্যারিবিয়ান এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডেঙ্গু ভাইরাস সাধারণত ফুসকুড়ি ও উচ্চ জ্বর তৈরি করে এবং এটি সাধারণত এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের জন্য প্রাণঘাতী অবস্থা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে ১ থেকে ৫ শতাংশ ব্যক্তির মধ্যে।

পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান অঞ্চল মূলত এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার বেশিরভাগ অঞ্চল এবং আমেরিকার হাওয়াই, ফ্লোরিডা, পুয়ের্তোরিকো ও উপসাগরীয়

পৃথিবীতে ৩ হাজারের বেশি প্রজাতির মশা রয়েছে; যদিও মাত্র তিন ধরনের মশা মানুষের মধ্যে রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী। এনোফিলিস মশা একমাত্র প্রজাতি, যা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। কিউলেক্স জাতীয় মশারা ওয়েস্টনাইল ভাইরাস, জাপানিজ এনসেফালিটিস ভাইরাস, সেন্ট লুই এনসেফালিটিস ভাইরাস এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফাইলেরিয়াসিস ও এভিয়ান ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। তৃতীয় প্রজাতির মশা, যারা 'এডিস' বা 'টাইগার মসকিউটো' নামে পরিচিত; ইয়েলো ফিভার, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জাপানিজ এনসেফালাইটিস ভাইরাস বহন করে। এডিস দ্বারা সংক্রমিত এ ভাইরাসগুলোর মধ্যে ইয়েলো ফিভার রোগটি ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত

এনোফিলিস মশা

কিউলেক্স মশা

এডিস মশা

উপকূলীয় রাজ্যগুলোয় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণ হলো– জ্বর, জয়েন্ট ব্যথা, মাথাব্যথা, পেশিব্যথা, জয়েন্ট ফোলা বা ফুসকুড়ি। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে সম্প্রতি এটি মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে।

২০১৩ সালের শেষের দিকে আমেরিকার ক্যারিবিয়ান দ্বীপে প্রথমবারের মতো চিকুনগুনিয়া ভাইরাস শনাক্ত হয়েছিল। এটি সাধারণত এক সপ্তাহের জন্য স্থায়ী হয় এবং বেশিরভাগ মানুষ কোনো সমস্যা ছাড়াই ভালো হয়ে যায়।

জিকা ভাইরাস যদিও প্রথমে মোটামুটি নিরীহ হিসেবে বিবেচিত ছিল; কিন্তু ২০১৬ সালের পর ব্রাজিলে জিকা ভাইরাস আক্রান্ত মায়েরা মস্তিষ্কের জন্মগত ত্রুটি মাইক্রোসেফালি নিয়ে শিশুর জন্ম দেওয়া শুরু করে, তখন থেকে জিকা ভাইরাস মানুষের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মশা প্রাণীদের চিনতে পারে কীভাবে? গবেষণায় দেখা যায়, প্রাণীদেহ থেকে বের হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড, গন্ধ, তাপমাত্রা ও চলাচল মশাকে মানুষ বা কোনো প্রাণীকে টার্গেট করতে সহায়তা করে।

মজার বিষয় হলো, শুধু স্ত্রী মশার মুখের অংশটি এমনভাবে তৈরি যে, শুধু তারাই প্রাণীদেহ থেকে রক্ত টানতে পারে। পুরুষ মশার মুখমণ্ডল এমনভাবে তৈরি, সে শুধু উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে রস সংগ্রহ করতে পারে।

রক্ত চুষতে নারী মশা তাদের প্রোবোসিস প্রাণীদের ত্বকে প্রবেশ করায়, যাতে থাকে দুটি নল; এর একটি দিয়ে এনজাইম ইনজেকশন দেয়, যা রক্ত জমাট বাঁধায় বাধা দেয় এবং অন্যটি দিয়ে নিজ শরীরে রক্ত টেনে নেয়। এ রক্ত কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব পুষ্টির জন্য ব্যবহার করে না; বরং বংশবিস্তারের জন্য ডিম তৈরিতে প্রোটিনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। নিজেদের খাবারের জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়েই উদ্ভিদের শর্করার ওপর নির্ভরশীল। তাহলে এ প্রাণীটি তৈরির কী দরকার ছিল প্রকৃতিতে? আসলে আপনার বাগানের মশা হলো পাখি, বাদুড়, ড্রাগনফ্লাইস ও ব্যাঙসহ কয়েক হাজার প্রাণীর খাদ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস।

বেশিরভাগ মশারই মানুষ প্রথম পছন্দ নয়, তাদের পছন্দ গবাদিপশু ও পাখি; বিপদে পড়লে বা সুযোগ পেলে তারা আপনাকে খাদ্যের উৎস বানায়। মশার জীবনচক্র শেষ করার জন্য রক্তগ্রহণ অপরিহার্য।

এর জীবনচক্রে চারটি দশা পাওয়া যায়– ডিম, লার্ভা, পিউপা এবং প্রাপ্তবয়স্ক মশা। একটি সম্পূর্ণ চক্রের জন্য প্রায় দুই সপ্তাহ প্রয়োজন, যা তাপমাত্রা এবং পানির প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। একটি স্ত্রী মশার জীবনকাল সাধারণত দুই থেকে চার সপ্তাহ এবং এ সময়ে সে তিন থেকে পাঁচ ব্যাচ ডিম দেয়। রক্ত গ্রহণের পর স্ত্রী মশা জমানো পানির ওপরে ডিম দেয়। মশারা এক জায়গায় ডিম না পেড়ে বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করে তার বংশধরদের বেঁচে থাকাটা নিশ্চিত করতে চায়।

পানির তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে মশার ডিমগুলো দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে লার্ভাতে পরিণত হয়; যদিও কিছু ডিমের ছয় মাস বিলম্বেও ফোটার নজির রয়েছে। এভাবে লার্ভা থেকে পিউপা হয়ে একসময় পূর্ণাঙ্গ মশায় পরিণত হতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় নেয়।

সব মশা কিন্তু সব ভাইরাস বহন করতে পারে না। এখানেই আসে ভেক্টরের যোগ্যতার প্রশ্ন। সব রক্তচোষা মশা রক্ত খেলেও শুধু নির্দিষ্ট কিছু ভাইরাস মশা অন্ত্রের এপিথেলিয়াল কোষগুলোকে সংক্রমিত করতে পারে এবং সেখানে নতুন ভাইরাস তৈরি করতে পারে।

এজন্যই আমরা শুধু এডিস মশা দ্বারা ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া ভাইরাস ছড়াতে দেখি, অন্য মশা দ্বারা নয়। মশার অন্ত্রে উৎপাদিত নতুন ভাইরাস সেখান থেকে বের হয়ে মশার লালাগ্রন্থি ও ডিম্বাশয়গুলোকে সংক্রমিত করে, যা পরবর্তী সময়ে মশার লালার মাধ্যমে অন্য সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমণ ঘটায় বা আক্রান্ত ডিম্বাশয় থেকে পরবর্তী সময়ে নতুন মশার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

এডিস মশা বিশ্ব জুড়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাস করে; প্রধানত ৩৫ ডিগ্রি উত্তর এবং ৩৫ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে, যেখানে শীতের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি ঠান্ডা হয় না।

যদিও কিছু মশা এ অক্ষাংশগুলোর আরো উত্তর বা দক্ষিণে ভ্রমণ করতে পারে, তবে তারা শীতে বাঁচতে অক্ষম। যেহেতু এডিস মশার উষ্ণ জলবায়ু প্রয়োজন, তাই তারা সাধারণত ১ হাজার মিটার উচ্চতার উপরে বাস করতে পারে না; যেখানে তাপমাত্রা বেশি শীতল।

জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক প্রজাতিকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে গেলেও কিছু কিছু প্রজাতির মশা দিনকে দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। সব মশার বংশবৃদ্ধির জন্য পানি প্রয়োজন; তাই এর নির্মূলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার পাশাপাশি সাধারণত জমে থাকা স্থায়ী পানির উৎসগুলো অপসারণ বা কীটনাশক স্প্রে করা হয়ে থাকে।

তবে মশার বিস্তার রোধে এসব চেষ্টা খুব কম প্রভাব ফেলছে এবং অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সম্ভবত তাদের সংখ্যা ও পরিধি আরো বাড়বে

এ মশা মানুষের বসবাসের জায়গার সঙ্গে যুক্ত। তারা সাধারণত তাদের পুরো জীবন বিভিন্ন স্থাপনা ও এর আশপাশে কাটায়, যেখানে ডিম ফোটানো সহজ।

জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক প্রজাতিকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে গেলেও কিছু কিছু প্রজাতির মশা দিনকে দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। সব মশার বংশবৃদ্ধির জন্য পানি প্রয়োজন; তাই এর নির্মূলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার পাশাপাশি সাধারণত জমে থাকা স্থায়ী পানির উৎসগুলো অপসারণ বা কীটনাশক স্প্রে করা হয়ে থাকে।

তবে মশার বিস্তার রোধে এসব চেষ্টা খুব কম প্রভাব ফেলছে এবং অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সম্ভবত তাদের সংখ্যা ও পরিধি আরো বাড়বে। সম্প্রতি ন্যাচার মাইক্রোবায়োলজিতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞান গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, অবস্থার কোনো উন্নতির সম্ভাবনা তো নেই-ই, বরং পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।

পরিসংখ্যানগত ম্যাপিংয়ের কৌশল ব্যবহার করে ওই গবেষকরা মডেল করে দেখিয়েছেন, কীভাবে দুটি রোগ বহনকারী এডিস প্রজাতির মশা– এডিস এজিপ্টি এবং এডিস অ্যালবপিকটাস গত ৩০ বছরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা পরবর্তী ৩০ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী কীভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

মশাবাহিত রোগগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো, ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক তৈরি; আর অন্যটি হচ্ছে মশা নিধন। অতীতে সব সময়ই ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন তৈরির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

গবেষকদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, এ প্রজাতির মশা– যারা জিকা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও ইয়েলো ফিভার ভাইরাস বহন করে, ভবিষ্যতে তা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে এবং লাখ লাখ মানুষকে এ রোগে আক্রান্ত করবে।

সমীক্ষার পূর্বাভাসে দেখা যায়, এডিস এজিপ্টি মশা ২০৫০ সালের মধ্যে আনুমানিক ১৯.৯৬ মিলিয়ন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করবে। ফলে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মশাবাহিত ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে।

মশাবাহিত এ রোগগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো, ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক তৈরি; আর অন্যটি হচ্ছে মশা নিধন। অতীতে সব সময়ই ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন তৈরির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৬ সালে ম্যাক্স থেইলর ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিন তৈরি করে নোবেল পুরস্কার পান। এর পর থেকে ইয়েলো ফিভারের প্রকোপ কমে এলেও সম্প্রতি আবার এর প্রাদুর্ভাবের খবর আসছে আফ্রিকার অনেক দেশ থেকে।

পাশাপাশি যদিও ধরে নেওয়া হয়েছে, এশিয়ার এডিস মশারা ইয়েলো ফিভার ভাইরাস ছড়াতে পারে না; তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, অচিরেই ইয়েলো ফিভার ভাইরাস ছড়াতে সক্ষম, এমন এডিস মশা এশিয়া জুড়ে বিস্তার লাভ করবে এবং এর ফলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে।

• **সাইফ উল্লাহ মুন্সী**, *অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ভাইরোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়*

ডেঙ্গু জ্বর, লক্ষণ ও প্রতিকার

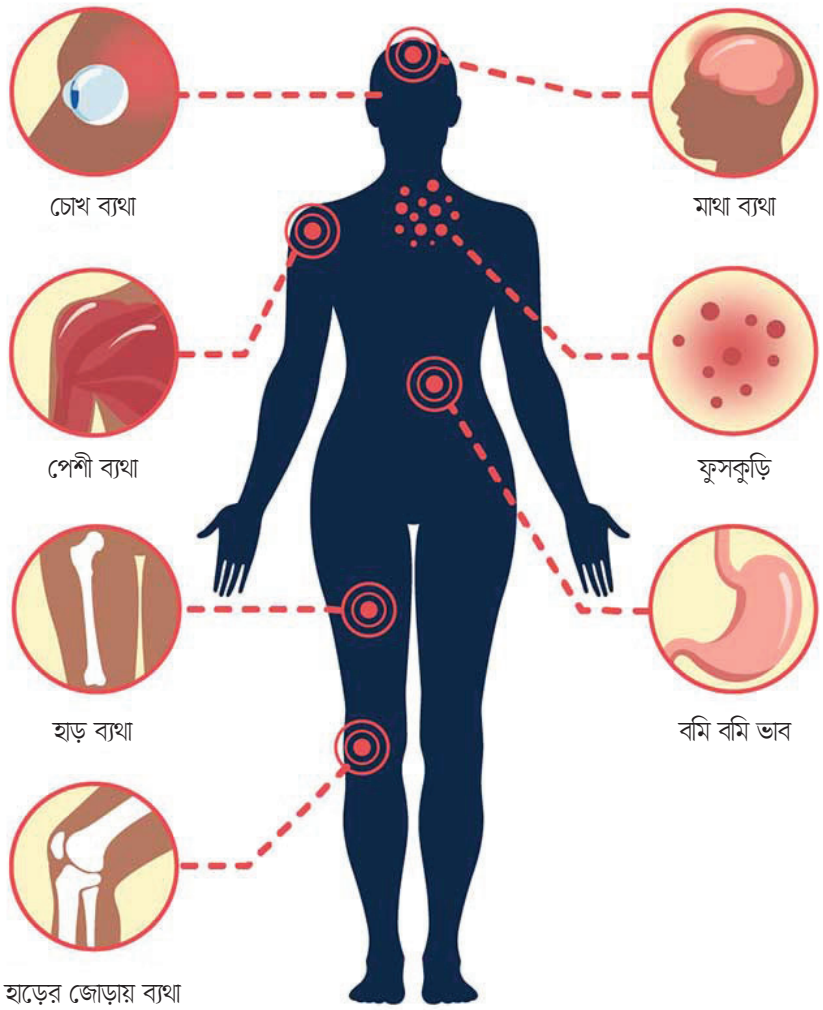

ডেঙ্গু জ্বরের উৎপত্তি ডেঙ্গু ভাইরাসের মাধ্যমে এবং এই ভাইরাসবাহিত এডিস ইজিপ্টাই নামক মশার কামড়ে হয়ে থাকে। ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। এবার এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে সেই মশাটি ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এভাবে একজন থেকে অন্যজনে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়িয়ে থাকে।

ডেঙ্গু প্রধানত দুই ধরনের হয়। এক. ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার। দুই. হেমোরেজিক ফিভার।

ডেঙ্গু জ্বর কখন ও কাদের বেশি হয়?

মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, বিশেষ করে গরম এবং বর্ষার সময়ে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বেশি থাকে। শীতকালে সাধারণত এই জ্বর হয় না বললেই চলে। শীতে লার্ভা অবস্থায় এই মশা অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। বর্ষার শুরুতে সেগুলো থেকে নতুন করে ডেঙ্গু ভাইরাসবাহিত মশা বিস্তার লাভ করে।

সাধারণত শহর অঞ্চলে, অভিজাত এলাকায়, বড় বড় দালানকোঠায় এই প্রাদুর্ভাব বেশি, তাই ডেঙ্গু জ্বরও এই এলাকার বাসিন্দাদের বেশি হয়। বস্তিতে বা গ্রামে বসবাসরত লোকজনের ডেঙ্গু কম হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস চার ধরনের হয়। তাই ডেঙ্গু জ্বরও চারবার হতে পারে। তবে যারা আগেও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে রোগটি হলে সেটি মারাত্মক হওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরে সাধারণত তীব্র জ্বর ও সেই সঙ্গে শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। জ্বর ১০৫ ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। শরীরে বিশেষ করে হাড়, কোমর, পিঠসহ অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশিতে তীব্র

ব্যথা হয়। এ ছাড়া মাথাব্যথা ও চোখের পেছনে ব্যথা হয়। অনেক সময় ব্যথা এত তীব্র হয় যে মনে হয় হাঁড় ভেঙে যাচ্ছে। তাই এই জ্বরের আরেক নাম 'ব্রেক বোন ফিভার'।

জ্বর হওয়ার চার বা পাঁচ দিনের সময় সারা শরীর জুড়ে লালচে দানা দেখা যায়। যাকে বলা হয় স্কিন র‍্যাশ, অনেকটা অ্যালার্জি বা ঘামাচির মতো। এর সঙ্গে বমি বমি ভাব এমনকি বমি হতে পারে। রোগী অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করে এবং রুচি কমে যায়। কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে এর দুই বা তিন দিন পর আবার জ্বর আসে। একে 'বাই ফেজিক ফিভার' বলে।

ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর

এই অবস্থাটা সবচেয়ে জটিল। এই জ্বরে ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ ও উপসর্গের পাশাপাশি আরো যে সমস্যাগুলো হয়, সেগুলো হলো :

- শরীরে বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত পড়া শুরু হয়। যেমন : চামড়ার নিচে, নাক ও মুখ দিয়ে, মাড়ি ও দাঁত থেকে, কফের সঙ্গে, রক্ত বমি, পায়খানার সঙ্গে তাজা রক্ত বা কালো পায়খানা, চোখের মধ্যে এবং চোখের বাইরে রক্ত পড়তে পারে। মেয়েদের বেলায় অসময়ে ঋতুস্রাব অথবা রক্তক্ষরণ শুরু হলে অনেকদিন পর্যন্ত রক্ত পড়তে থাকা ইত্যাদি হতে পারে।
- এই রোগের বেলায় অনেক সময় বুকে পানি, পেটে পানি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেক সময় লিভার আক্রান্ত হয়ে রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম

ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহ রূপ হলো ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের সঙ্গে সার্কুলেটরি ফেইলিউর হয়ে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হয়। এর লক্ষণ হলো :

- রক্তচাপ হঠাৎ কমে যাওয়া।
- নাড়ির স্পন্দন অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুত হওয়া।
- শরীরের হাত-পা ও অন্যান্য অংশ ঠান্ডা হয়ে যায়।
- প্রস্রাব কমে যায়।
- হঠাৎ করে রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে।
- এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

ডেঙ্গু জ্বরের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। তবে এই জ্বর সাধারণত নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। তাই উপসর্গ অনুযায়ী সাধারণ চিকিৎসা যথেষ্ট। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই ভালো। যেমন :

- শরীরের যে-কোনো অংশে রক্তপাত হলে
- প্লাটিলেটের মাত্রা কমে গেলে
- শ্বাসকষ্ট হলে বা পেট ফুলে পানি এলে
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেলে
- জন্ডিস দেখা দিলে
- অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা দেখা দিলে
- প্রচণ্ড পেটে ব্যথা বা বমি হলে।

কী কী পরীক্ষা করা উচিত?

আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডেঙ্গু জ্বর হলে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দরকার নেই, এতে অযথা অর্থের অপচয় হয়।

- জ্বরের চার থেকে পাঁচ দিন পরে সিবিসি এবং প্লাটিলেট করাই যথেষ্ট। এর আগে করলে রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকে এবং অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন। প্লাটিলেট কাউন্ট ১ লাখের কম হলে ডেঙ্গু ভাইরাসের কথা মাথায় রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- ডেঙ্গু অ্যান্টিবডির পরীক্ষা পাঁচ থেকে ছয় দিনের পর করা যেতে পারে। এই পরীক্ষা রোগ শনাক্তকরণে সাহায্য করলেও রোগের চিকিৎসায় এর কোনো ভূমিকা নেই। এই পরীক্ষা না করলেও কোনো সমস্যা নেই। এতে শুধু শুধু অর্থের অপচয় হয়।
- প্রয়োজনে ব্লাড সুগার, লিভারের পরীক্ষাগুলো যেমন এসজিপিটি, এসজিওটি, এলকালাইন ফসফাটেজ ইত্যাদি করা যাবে।
- চিকিৎসক যদি মনে করেন রোগী ডিআইসি জাতীয় জটিলতায় আক্রান্ত, সে ক্ষেত্রে প্রোথ্রোম্বিন টাইম, এপিটিটি, ডি-ডাইমার ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারেন।

চিকিৎসা

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগী সাধারণত পাঁচ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। এমনকি কোনো চিকিৎসা না করালেও। তবে রোগীকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই চলতে হবে। যাতে ডেঙ্গুজনিত কোনো মারাত্মক জটিলতা না হয়। ডেঙ্গু জ্বরটা আসলে গোলমেলে রোগ, সাধারণত লক্ষণ বুঝেই চিকিৎসা দেওয়া হয়।

- সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামে থাকতে হবে।
- যথেষ্ট পরিমাণে পানি, শরবত, ডাবের পানি ও অন্যান্য তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে।
- খেতে না পারলে দরকার হলে শিরাপথে স্যালাইন দেওয়া যেতে পারে।
- জ্বর কমানোর জন্য শুধু প্যারাসিটামল-জাতীয় ব্যথার ওষুধই যথেষ্ট। এসপিরিন বা ডাইক্লোফেনাক-জাতীয় ব্যথার ওষুধ কোনোক্রমেই খাওয়া যাবে না। এতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়বে।
- জ্বর কমানোর জন্য ভেজা কাপড় দিয়ে গা মোছাতে হবে।

- **লেখক**, *ডিন, মেডিসিন বিভাগ,*
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল হাসপাতাল

এডিস মশার কামড় থেকে বাঁচতে

কখনো ভেবে দেখেছেন কি, কেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রী এডিস মশা গায়ে বসলে আমরা বুঝতে পারি না বা অনেক সময় কামড়ানোর পর কেন বুঝতে পারি?

এর কারণ, স্ত্রী এডিস মশার Back biting behaviour, অর্থাৎ এরা Host-কে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পছন্দ করে। যেমন কানের পেছনে, হাতের কনুই বা পায়ের গোড়ালি, যেন প্রাথমিকভাবে আপনি তাকে Detect করতে না পারেন। অফিস-আদালত বা স্কুল কলেজে স্ত্রী এডিস মশার দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ, প্রথমত এরা Daytime biter আর দ্বিতীয়ত আমাদের Body position and mind set-up।

টেবিল-চেয়ার ব্যবহার করায় আমাদের শরীরের অর্ধেক অংশই দৃষ্টির আড়ালে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখায় আর আমরা অফিশিয়াল কার্যক্রমে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আর এই Concentration/focus of mind on one thing exclude our feelings or sensation from the surroundings। আর এর সুযোগটাই স্ত্রী এডিস মশা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে থাকে।

স্ত্রী এডিসের সবচেয়ে Worst বৈশিষ্ট্য হলো intermittent feeding capability এবং একই সময়ে বিভিন্ন Host থেকে রক্ত সংগ্রহের প্রবণতা। এরা কুকুর/বিড়াল/গৃহপালিত পশুপাখি থেকে রক্ত সংগ্রহের পাশাপাশি মানুষ থেকেও রক্ত সংগ্রহ করে ডিম পাড়ার জন্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে একাধিক মানুষ থেকেও রক্ত সংগ্রহ করে থাকে। এই Host seeking behaviour এদেরকে রোগ সংক্রমণ বা ছড়ানোর ব্যাপারে এতটা দক্ষ করে তোলে।

তাই এডিস মশার কামড়/দংশন থেকে বাঁচতে আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি :

১. পার্সোনাল প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা। বাইরে বের হবার পূর্বে বা ঘরে অবস্থানের সময়ও ফুলহাতা জামা ব্যবহার করা (সাদা/হালকা রঙের)।

২. সাদা রঙের প্যান্ট/পায়জামা এবং অবশ্যই পা-মোজা (সাদা রঙের) ব্যবহার করা।

৩. বিভিন্ন ধরনের মশা তাড়ানোর ক্রিম/তেল শরীরের উন্মুক্ত স্থানে ব্যবহার করা। যেমন– Odomos, Fabric roll on, neem oil, lavender oil. আর যদি এসবের কোনো কিছুই পাওয়া না যায়, তবে নিমপাতা বেটে এর রস হাতে-পায়ে ব্যবহার করতে পারেন।

৪. স্ত্রী এডিস মশা সবচেয়ে বেশি active থাকে সূর্যোদয়ের পর থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত এবং সূর্যাস্তের বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে। বাড়িতে এবং স্কুল-কলেজে/অফিসে (অফিস টাইমের আগেই) কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বা ক্ষেত্রবিশেষে নিজ উদ্যোগে সকাল ৬-৭টার মধ্যে প্রতিটি রুমে কয়েল জ্বালিয়ে দিন/কীটনাশক স্প্রে করুন (দরজা-জানালা বন্ধ রাখা অবস্থায়)। এর দু-তিন ঘণ্টা পর ফুলস্পিডে ফ্যান চালু করে দিন এবং প্রতিটি রুমের একটি করে জানালা খুলে দিন। এতে করে ক্ষতিকর ধোঁয়া ও মশা দুটোই ইনশাআল্লাহ বেরিয়ে যাবে [আপনার কক্ষটি ১ম/২য় তলায় হলে কয়েল বন্ধ না করাই ভালো। বাড়িতে বা সন্ধ্যাকালীন অফিসে বিকেল ৪টার সময় উপরিউক্ত প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন এবং এ ক্ষেত্রে ধোঁয়া ও মশা বেরিয়ে যাবার পর দরজা-জানালা একেবারে বন্ধ করে দিন এবং প্রয়োজনে মশার কয়েল নিভিয়ে ফেলুন।

৫. আমাদের Body odor বা দেহের গন্ধে স্ত্রী মশা সবাচাইতে বেশি আকৃষ্ট হয়। তাই সম্ভব হলে নিমপাতা সেদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে গোসল করুন।

৬. ছাদে বা পানির ট্যাংকের পাশে বা গ্যারেজে যে সমস্ত জায়গায় পানি জমে থাকে সেখানে পানি অপসারণ করা না গেলে প্রয়োজনে ১/২ মুঠো লবণ ছিটিয়ে দিন।

৭. যানবাহন/প্রাইভেট কার রাতে বন্ধ করার আগে কীটনাশক স্প্রে করুন।

৮. সর্বোপরি ঘরে অবস্থানকালে ঘুমানোর সময় (দিনে/রাতে) মশারি ব্যবহার করুন।

• **লেখক**, *সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং (সাবেক) জাতীয় পরামর্শদাতা (কীটতত্ত্ববিদ), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।*

ডেঙ্গু জ্বর
রোগীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

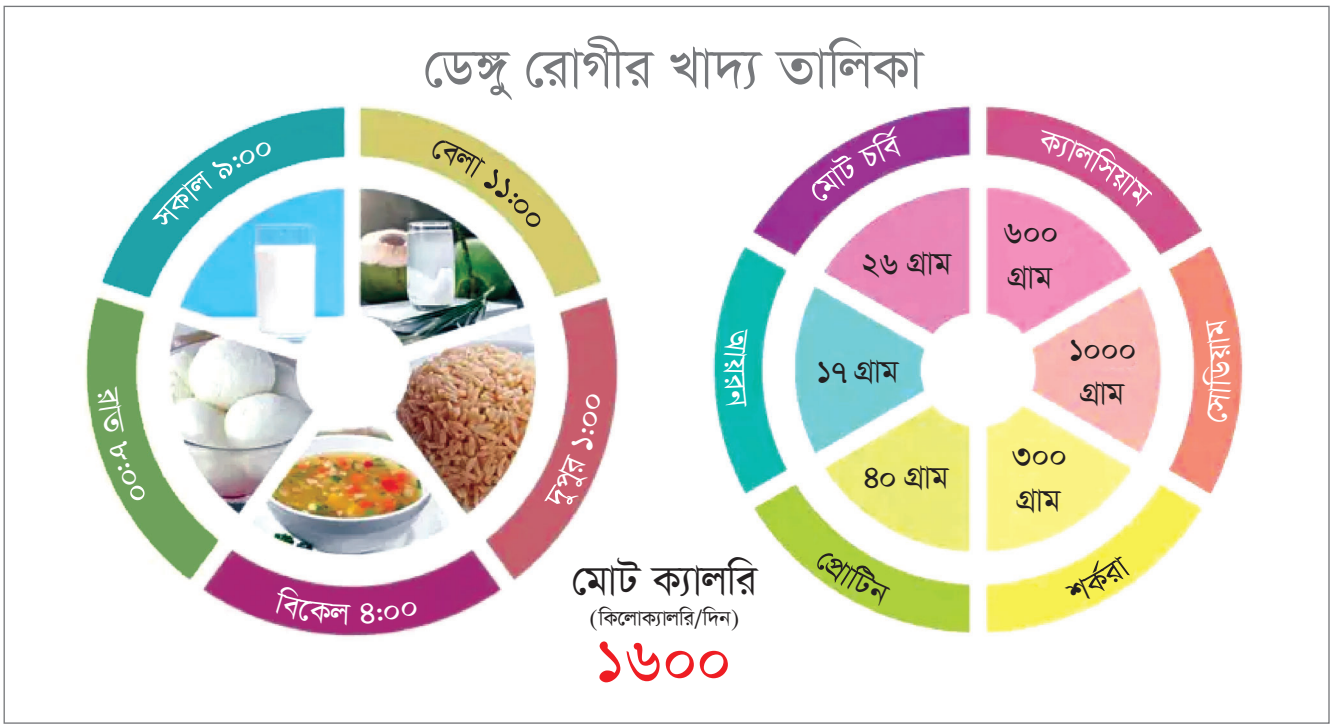

ডেঙ্গু জ্বর হলে খাবারদাবার ও পুষ্টির দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। বাড়িতে চিকিৎসা নিলে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন। ডেঙ্গু জ্বর হলে এবার প্লাটিলেট কমে যাওয়া ছাড়াও রক্তচাপ কমে গিয়ে রোগী শকে চলে যাচ্ছে। কারো কারো ক্ষেত্রে হেমোরেজও হচ্ছে। আবার কারো ক্ষেত্রে প্লাটিলেট কাউন্ট কমলেও তা সহনীয় পর্যায়ে থাকছে। ডেঙ্গু জ্বরের কোনো ভ্যাক্সিন বা অ্যান্টিবায়োটিক নেই। তাই প্রচলিত চিকিৎসা হলো জ্বর ও ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল আর ফ্লুইড ব্যালেন্স করে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখা। ডেঙ্গু রোগীর খাদ্য ও পুষ্টির প্রতিও রাখতে হবে বিশেষ নজর।

- যারা হাসপাতালে থাকবেন তাদের IV fluid-এর পাশাপাশি মুখে তরল খাবার দিয়ে total fluid ব্যালেন্স করতে হবে। অপর পক্ষে যারা বাসায় আছেন তাদের পানিসহ অন্যান্য তরল মিলে তিন লিটার সারা দিনে total fluid অর্থাৎ মুখে খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- জ্বরে ক্যালোরি-চাহিদা বেড়ে যায়। তাই ক্যালোরিযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে। এ সময় মুখে রুচিও থাকে না। তাই এমন খাবার দিতে হবে, যা অল্প খেলেও চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। যেমন– ভাতের পরিবর্তে খিচুড়ি, পায়েস, ফিরনি বা পুডিং দেওয়া যেতে পারে। ফলে একটা খাবার থেকেই সব উপাদান পাওয়া যাবে।
- মুখে ফলের রস, ডাবের পানি, সুপ ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে।
- যদি জ্বরের সঙ্গে পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া ও বমি হয়ে থাকে তবে শাকসবজি, ডাল, দুধ ও দুধে তৈরি খাবার বাদ দিতে হবে। এ অবস্থায় ডাবের পানি, মুরগির সুপ, চালের সুপ বা ভাতের মাড়, আপেলের জুস খুব ভালো কাজ করে।
- মূল খাবার হিসেবে ভাত বা জাউয়ের সঙ্গে কাঁচকলার ঝোল দিলে রোগী উপকৃত হবে।
- মাছ বা মাংস বন্ধ না করে সহজপাচ্য মাছ, যেমন– শিং, শোল, পাবদা ইত্যাদি লোফাইবার মাছ বা মুরগির তরকারি দেওয়া ভালো।
- গায়ে কোনো Rash থাকলে সাধারণত অ্যালার্জিক খাবার, যেমন– গরুর মাংস, হাঁসের ডিম, চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ ও বেগুন ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো।
- পেঁপে পাতার রস খাওয়া যেতে পারে। এতে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান পাওয়া যায়, যা শরীর ব্যথা কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা না করিয়ে লতাপাতা দিয়ে চিকিৎসা ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রাণঘাতী হতে পারে। তাই জ্বরসহ অন্য উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং সচেতন হোন।

- **মাহফুজা আফরোজ সাথী**, *চিফ ডায়েটিশিয়ান, ইমপেরিয়াল হসপিটাল লিমিটেড, চট্টগ্রাম।*

ডেঙ্গু জ্বরের পর করণীয়

ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশের আনাচেকানাচেও ডেঙ্গু রোগী পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ থাকে। কারণ, এ সময়টিতে এডিস মশার বিস্তার ঘটে। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে ডেঙ্গু জ্বরের সময়কাল এগিয়ে এসেছে এবং লম্বা হয়েছে। এ বছর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকসহ অনেকে মারাও গেছে। তাই ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে মানুষের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র রায় বলেন, এখন যেহেতু ডেঙ্গুর সময়, সেজন্য জ্বর হলে অবহেলা করা উচিত নয়। জ্বরে আক্রান্ত হলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই উত্তম হবে। জ্বরের সঙ্গে যদি সর্দি-কাশি, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া কিংবা অন্য কোনো সমস্যা থাকে, সেটি ডেঙ্গু না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে। আবার একই সঙ্গে ডেঙ্গু জ্বর ও অন্য সমস্যাও হতে পারে। আবার ডেঙ্গু জ্বর নেমে গেলেও চিকিৎসকের পরামর্শে চলতে হবে। কারণ, জ্বর-পরবর্তী সমস্যায় মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে।

কী খাবেন

প্রচুর পরিমাণে তরলজাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। যেমন– ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের জুস এবং খাওয়ার স্যালাইন। এমন নয় যে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে, পানিজাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার, ভাজাপোড়া খাবার এই সময়ে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

যেসব ওষুধ খাওয়া উচিত নয়

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করা যাবে না। আরো কিছু ওষুধ আছে, যেগুলো বন্ধ করতে হতে পারে। অর্থাৎ কী ওষুধ খাওয়া যাবে আর কী ওষুধ খাওয়া যাবে না, তা চিকিৎসকের পরামর্শে ঠিক করুন।

প্লাটিলেট বা রক্তকণিকা নিয়ে চিন্তিত?

ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে প্লাটিলেট বা রক্তকণিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি শরীরের কোনো অংশ দিয়ে রক্তপাত না হয়, তবে প্লাটিলেটের সংখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কখন প্লাটিলেট দিতে হবে, সেই বিষয়টি বরং চিকিৎসকের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি সতর্কতা

মেয়েদের বেলায় অসময়ে ঋতুস্রাব অথবা রক্তক্ষরণ শুরু হলে অনেক দিন পর্যন্ত রক্ত পড়তে পারে। যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি, তাদেরও এই ডেঙ্গু জ্বরের কারণে তা শুরু হয়ে যেতে পারে। এমন হলে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে জানাতে হবে। তা না হলে প্রচুর রক্তপাত হতে হতে রোগী শকে গিয়ে মারাও যেতে পারে।

ডেঙ্গু হলেই কি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়?

ডেঙ্গু জ্বরের তিনটি ভাগ রয়েছে। ভাগগুলো হচ্ছে– এ, বি এবং সি।

প্রথম ক্যাটাগরির রোগীরা স্বাভাবিক থাকে। তাদের শুধু জ্বর থাকে। অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগী 'এ' ক্যাটাগরির। তাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

'বি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গু রোগীদের শরীরে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন– তার পেটে ব্যথা হতে পারে, বমি হতে পারে প্রচুর কিংবা সে কিছুই খেতে পারছে না। শরীরের যে-কোনো অংশে রক্তপাত হতে পারে, জন্ডিস দেখা দিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় জ্বর ভালো হয়ে যায় কিন্তু রক্তচাপ কমে যায়, শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে হাসপাতাল ভর্তি হতে হবে।

'সি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গু জ্বর সবচেয়ে খারাপ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আইসিইউর প্রয়োজন হতে পারে।

পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে

জ্বর হলে বিশ্রামে থাকতে হবে। জ্বর নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি সাধারণত প্রতিদিন যেসব পরিশ্রমের কাজ করে, সেগুলো না করাই ভালো। জ্বর ভালো হলেও বিশ্রামে থাকতে হবে। কারণ, ডেঙ্গু জ্বর-পরবর্তী সমস্যা তাতে আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে, যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কত দিন বিশ্রাম নিতে হবে তা ডেঙ্গু-পরবর্তী সমস্যার তীব্রতার ওপর নির্ভর করবে। তাই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।

- **লেখক**, *চিকিৎসক*
  তথ্যসূত্র: *প্রথম আলো*

আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই

ঢাকাসহ সারা দেশে ডেঙ্গু আতঙ্ক। শহুরে মানুষদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও এই রোগের আতঙ্কে রয়েছে সব সময়। এমন পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু ছড়ানোর কোনো ঝুঁকি আছে কি না, এসব বিষয় এবার কিছুটা চিন্তার উদ্রেক করছে। যারা ভুগছেন, ভুগেছেন কিংবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে আছেন– সবার মধ্যেই এই চিন্তা।

যারা জ্বরে আক্রান্ত তারা গ্রামে যেতে পারবেন কি না

যারা ডেঙ্গু জ্বরে ভুগছেন, অর্থাৎ যাদের জ্বর চলছে কিংবা বাড়ি যাবার আগেই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে বাড়ি না যাওয়াটাই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। কারণ এবার ডেঙ্গুর ধরনের ভিন্নতার জন্য হঠাৎ করে জটিলতা দেখা দিচ্ছে। কাজেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনকি বড় শহরগুলোর বাইরে যথাযথ চিকিৎসা পাওয়া যাবে কি না অথবা কোনো জটিলতা হলে সামাল দেওয়া যাবে কি না, তা বিবেচনায় নিতে হবে। তাই জ্বর নিয়ে বাড়ি না যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। তবে যাদের জ্বর নেই তারা যেতে পারবেন।

যারা সম্প্রতি ডেঙ্গু জ্বর থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তারা গ্রামে গেলে তাদের থেকে ডেঙ্গু গ্রামে ছড়াতে পারে কি না

না, তাদের থেকে জ্বর ছাড়ানোর আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কারণ, আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ডেঙ্গুর লক্ষণ প্রকাশের পর, অর্থাৎ জ্বর শুরুর চার-ছয় দিন পর্যন্ত ডেঙ্গু ভাইরাস থাকে। এই সময়ের মধ্যে স্ত্রী এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে ডেঙ্গু ছড়াতে পারে। সুতরাং যারা জ্বর থেকে সেরে উঠেছেন তাদের কাছ থেকে নতুন করে ডেঙ্গু ছড়ানোর আশঙ্কা নেই। আবার যদি কারো শহর থেকে শরীরে ভাইরাস প্রবেশ করে এবং গ্রামে গিয়ে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবুও গ্রামে তার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়ানোর আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কারণ ডেঙ্গুর একমাত্র বাহক স্ত্রী এডিস মশা, অন্য মশার কামড়ের দ্বারা ডেঙ্গুর জীবাণু ছড়ায় না। আর এডিস মশা থাকে শহরে, গ্রামে সাধারণত এ মশার অস্তিত্ব নেই। কোনো কোনো প্রিন্ট মিডিয়ার তথ্য বলা হচ্ছে, 'শহর থেকে লাখ লাখ লোক ভাইরাস বহন করে গ্রামে যাবে এবং তা বহন করে গ্রামে-গঞ্জে ডেঙ্গু ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়বে'– যা সঠিক নয়।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে থাকা যাবে কি?

ডেঙ্গু কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। কাজেই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া, একসঙ্গে থাকা-খাওয়া বা রোগীর ব্যবহার্য কোনো জিনিস ব্যাবহার করায় কোনো বাধা নেই।

ডেঙ্গু আক্রান্ত সকল রোগীর হাসপাতালে বা ক্লিনিকে ভর্তির প্রয়োজন আছে কি না

ডেঙ্গুর প্রকোপের চেয়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যেন আতঙ্কই বেশি। সাধারণ জ্বরেও সবাই ছুটছেন হাসপাতালে। ফলে রাজধানীর সব হাসপাতালে ভিড় বাড়ছে। আসলে সব ডেঙ্গু জ্বরে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে বাসায় চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব। তবে অতিরিক্ত বমি হলে বা রোগী যদি খেতে না পারে, রক্তের প্লাটিলেট অতিরিক্ত কমে গেলে, শরীরের কোনো অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হলে (যেমন রক্তবমি, কালো পায়খানা বা নাকে, দাঁতের গোড়া থেকে ইত্যাদি) হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। এ ছাড়া যারা অন্যান্য রোগে ভোগেন যেমন হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক, কিডনি রোগ, ডায়াবেটিসসহ গর্ভবতী মহিলার ডেঙ্গু জ্বর হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা নিতে হবে। প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। তাই জ্বর হলেই অযথা হাসপাতালে ভিড় জমানোর প্রয়োজন নেই। প্রথমে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, তারপর প্রয়োজন হলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

সুস্থ-অসুস্থ সকলের ডেঙ্গু শনাক্তের জন্য রক্ত পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে কি না

ডেঙ্গু মৌসুমের শুরুতে অনেকেই অল্প জ্বরকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। ফলে হঠাৎ করে কিছু কিছু রোগীর জটিলতা শনাক্ত হয়েছে এবং মারাও গেছেন অনেকে। পাশাপাশি এবারের সামগ্রিক প্রকোপ ও মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হওয়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ফলে একটু ভয় বা সন্দেহ হলেই মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে ছুটছেন। যেমন দেখা গেল, কারো একটু শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, জ্বরজ্বর লাগে কি না তাও নিশ্চিত নন– তিনিও সন্দেহ দূর করতে পরীক্ষা করছেন। আবার কারো হয়তো চোখের সামনে একটা মশায় কামড়িয়েছে, ভয় পেয়ে তিনিও ছুটেছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে টেস্ট করানোর জন্য এ ধরনের শঙ্কিত মানুষের লম্বা লাইন। ফলে যারা আসলেই ডেঙ্গু বা অন্য রোগে আক্রান্ত, তারা যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে পারছেন না। ফলে প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সুতরাং কোনো সন্দেহ হলে বা উপসর্গ দেখা দিলে প্রথমেই নিকটস্থ ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজন হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাবেন। এতে সকলের ভোগান্তি কমবে। অযথা অর্থের অপচয় হবে না।

> অযথাই আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। চাইলে যে-কোনো সময় গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন। গ্রামে ডেঙ্গু ছড়ানোর কোনো আশঙ্কা নেই। তবে সচেতন থাকুন

পরিশেষে অযথাই আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। চাইলে যে-কোনো সময় গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন। গ্রামে ডেঙ্গু ছড়ানোর কোনো আশঙ্কা নেই। তবে সচেতন থাকুন। শহর থেকে গ্রামে গিয়ে রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

● **লেখক**, *সাবেক ডিন ও চেয়ারম্যান, মেডিসিন অনুষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা*

গর্ভাবস্থায় ডেঙ্গু হলে কী করবেন

ডেঙ্গু জ্বর একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এডিস মশা এই রোগের বাহক। ডেঙ্গু রোগীদের বাসায় চিকিৎসা করা সম্ভব। কিন্তু অবস্থা গুরুতর হলে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয়।

এখন সারা বাংলাদেশেই ভয়াবহভাবে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই মারা গেছে আর এর মধ্যে নারী ও শিশুরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ইতোমধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে গর্ভবতী অনেক মারা গেছেন। গর্ভবতী মায়েরা ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে তার তীব্রতা অনেক বেশি হয়। তাই গর্ভবতী ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দিতে হয়।

গর্ভবতী নারীরা কেন বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?

১. ডেঙ্গু রোগের উপসর্গ অনেকটা প্রেগন্যান্সির কিছু উপসর্গের সঙ্গে মিল রয়েছে, তাই রোগ নির্ণয় দেরি হতে পারে।

২. প্রেগন্যান্সিতে রক্তের CBC রিপোর্টে পরিবর্তন হয়। তাই ডেঙ্গু রোগীদের রক্তের রিপোর্ট যেমন হয়, তার সঙ্গে সব সময় নাও মিলতে পারে।

৩. আবার ডেঙ্গু রোগীদের প্লাটিলেট কমে, লিভার ফাংশন খারাপ হতে পারে, পেটে পানি জমা হতে পারে, এইসব গর্ভবতীর হেলপ সিনড্রোম (HELLP Syndrom)-এর সঙ্গে মিলে যায়, যা খুব ঝুঁকিপূর্ণ একটা অবস্থা।

৪. গর্ভবতী নারীদের যদি রক্তক্ষরণ শুরু হয়, তা মা ও বাচ্চা দুজনের জন্যই ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

৫. আবার একজন গর্ভবতী রোগীর যে-কোনো অসুখ বা সমস্যা তার গর্ভস্থ শিশুটির জন্যও ঝুঁকির কারণ হয়, তাই চিকিৎসার সময় অনেক কিছু ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

কী করবেন

১. গর্ভবতী নারীকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

২. জ্বর ও ব্যথার জন্য প্যারাসিটামলের বাইরে আর কিছু দেওয়া যাবে না।

৩. মুখে স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি তরল খাবার খেতে হবে।

৪. ক্রিস্টালয়েড স্যালাইন দিতে হবে শিরাপথে, এটা ওজন হিসাব করে ঠিক করতে হবে।

৫. বমি থাকলে ওষুধ দিতে হবে।

৬. রক্তক্ষরণ হলে বা হিমোগ্লোবিন কমে গেলে ফ্রেশ রক্ত দেওয়া যায়।

৭. প্লাটিলেট অনেক কমে গেলে বা অল্প সময়ের মধ্যে অপারেশন করা লাগলে প্লাটিলেট দেওয়া যেতে পারে।

৮. মায়ের পালস, ব্লাড প্রেশার বারবার রেকর্ড রাখতে হবে।

● ***লেখক***, *ডা. শাহীনা বেগম শান্তা, কনসালট্যান্ট (গাইনি), বি আর বি হাসপাতাল*

ডেঙ্গু জ্বর কাদের সবচেয়ে বেশি হয়? জেনে নিন করণীয়

কোনো দেশই মশামুক্ত নয়। প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকেই মশা আছে। ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু মশা বিলুপ্ত হয়নি। ডেঙ্গু রোগের বাহক যে এডিস মশা তা আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই আছে বলে অনেকেই দাবি করেছেন। অন্য অনেক ভাইরাল জ্বরের মতো হওয়ায় হয়তো আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না, কখন আমাদের এই মশা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি।

এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুর চারটি সেরোটাইপ আবিষ্কৃত হয়েছে– ১, ২, ৩ ও ৪। একটি দ্বারা আক্রান্ত হলে সেটির বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি মানে সেই ধরনের বিরুদ্ধে কার্যকরী শক্তি তৈরি হয়ে যায়। তবে নতুন আরেকটি সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হলে তখনই শুরু হয় ঝামেলা। কারণ পূর্বে সৃষ্ট অ্যান্টিবডির সঙ্গে এটি সংযোগ স্থাপন করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এবারের ডেঙ্গুর ভয়াবহতা তাই ব্যাপক।

মশা যখন আমাদের শরীরে হুল ফোটায় বা কামড় দেয় তখন সেটি আমাদের চামড়ার নিচে জমা হয়। সেখান থেকে সেটি রক্তের মাধ্যমে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পৌঁছায় ধীরে ধীরে। তারপর শুরু হয় নানা লক্ষণ এবং পরিশেষে পরিণতি।

এখন কথা হলো, মশা তো কাউকে বাদ দেয় না, তাহলে কেউ বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন?

সবার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা এক নয়। কেন সেটি? তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং হবে আরো। প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি থিওরির মধ্যে রয়েছে মাইক্রো-নিউট্রিয়েনটের তারতম্য। এ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার পেছনে The American Society of Tropical Medicine and Hygiene একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিল। তাতে তারা দেখিয়েছিল, কীভাবে নানা মাইক্রো-নিউট্রিয়েনটের অভাবে ডেঙ্গুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। তার মধ্যে একটি হলো ভিটামিন ডি।

ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের Adaptive ও Innate Immunity– দুটিই কার্যকরী রাখতে সহযোগিতা করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ডেঙ্গুতে যখন শরীরে রক্তক্ষরণ হয় তখন রক্তে ভিটামিন ডি-এর একটি নির্দিষ্ট উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তার মানে এর বিরুদ্ধে ভিটামিন ডি কার্যকর থাকে। তারা প্রস্তাব করেছে, ডেঙ্গু মৌসুমে স্বল্প মাত্রায় ভিটামিন ডি গ্রহণ করার জন্য।

এরপর রয়েছে জিংক। জিংক আমাদের শরীরে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করার শক্তি তৈরি করে।

ইন্দোনেশিয়ায় এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যেসব রোগী ডেঙ্গুর তীব্র সংক্রমণে আক্রান্ত

তাদের শরীরে জিংকের অভাব তীব্র ছিল। তাই জিংক স্বল্প মাত্রায় গ্রহণ করার পক্ষে তারা সমর্থন জানিয়েছে। লক্ষ রাখা দরকার, সেটি যেন উচ্চমাত্রায় না হয়।

এর পরপরই রয়েছে ভিটামিন ই। আমরা অনেকেই জানি, এটি Antioxidant হিসেবে কাজ করে। এর অভাবে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ভারতে এটি নিয়ে কয়েকটি গবেষণা হয়েছে। ডেঙ্গু যখন হয় তখন অনেকেরই প্লাটিলেটের পরিমাণ কমে যায়। তারা দেখেছে, যেসব রোগীকে ভিটামিন ই দেওয়া হয়েছে একটি করে, তাদের প্লাটিলেটের পরিমাণ দ্রুত বেড়েছে।

মনে রাখা দরকার, সুষম খাবার খেলে এসব মাইক্রো-নিউট্রিয়েনটের অভাব পূরণ হয়ে যায়। তাই খাদ্যতালিকায় দেশি ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি রাখা উচিত। আমরা অনেকেই মুখের রুচির কথা ভেবে এসব খাবার পরিমাণমতো গ্রহণ করি না। তখনই হয় বিপত্তি।

ডেঙ্গু মৌসুমে আমাদের সবার এসব খেয়াল রাখা উচিত। কারণ ডেঙ্গুর মৌসুম কিন্তু পরিসংখ্যানমতে সামনে আরো কয়েক মাস থাকবে

• **লেখক**, *ডা. আশরাফুল হক, মেডিক্যাল অফিসার, এমআইএস, ডিজিএইচএস*

ডেঙ্গু ভাইরাস যেভাবে শনাক্ত করা হয়

ডেঙ্গু নিয়ে আমাদের বর্তমানে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। হবেই না বা কেন? জীবন তো একটাই, কে চায় পৃথিবী ছেড়ে হঠাৎ চলে যেতে?

বলা হয়ে থাকে যেই দেশে ডেঙ্গুর মশা একবার ঢুকেছে তা আর বের হয়নি। আসলেই কিন্তু তাই। পৃথিবীতে বর্তমানে ১২৮টির বেশি দেশে ডেঙ্গু জীবাণুবাহী মশা রয়েছে।

ডেঙ্গু জীবাণুবাহী মশার নাম হলো এডিস, পরিষ্কার পানিতেই তার বাস। একে নিয়ে তাই আতঙ্কও বেশি। একটি প্রাপ্তবয়স্ক মশা সুযোগ ও পরিবেশ পেলেই ১ মাসে লাখের ওপর ডিম উৎপাদন করতে পারে, আবার এই ডিম এক বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে সক্ষম। তাই সচেতনতা ও সামগ্রিক প্রয়াস ছাড়া এই দুর্যোগ আটকে রাখা সম্ভব নয়।

ডেঙ্গুতে কিন্তু মৃত্যুর হার কম। মাত্র এক ভাগ বলতে গেলে। চিকিৎসা না নিলে সেটি হতে পারে ২-৬ শতাংশ। কিন্তু মৃত্যু আমাদের কারো কাম্য নয়। তাই একে নিয়ে এত উদ্বেগ। স্বাস্থ্য খাতে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই নিজ উদ্বেগে চিকিৎসা করানো বা পরীক্ষা করানোর পরিমাণ বাড়ছে। যে দেশে কোনো এলাকায় ডায়রিয়া হলে সেই এলাকা মৃত এলাকা হয়ে যেত, সেই দেশে লোকজন সচেতনভাবে চিকিৎসা নিচ্ছে– দেখলেই ভালো লাগবে সবার।

তবে এই রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে পরীক্ষা করা বা চিকিৎসা নেওয়া– দুটোই হিসাব করে করলে সবারই উপকার। পরীক্ষার সরঞ্জামের ব্যবস্থা হয়তো ফুরাবে না, সরকারিভাবে ওষুধেরও হয়তো কমতি হবে না, তবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনবলের অভাবে মৃত্যুপথযাত্রী একজন হয়তো পর্যাপ্ত সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তাই সচেতনভাবে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে আমাদের এটি মোকাবিলা করতে হবে।

প্রথমে কী পরীক্ষা করা হয়

ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এমন কাউকে সন্দেহ করা হলে তার মূলত রক্ত পরীক্ষা করা লাগে। আমাদের দেশে যেহেতু ডেঙ্গু নতুন নয়, কাজেই এই পরীক্ষার ধরনও আলাদা হতে পারে, ফলাফলও আলাদা হতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের লক্ষণ দেখা গেলে এনএস১ এন্টিজেন পরীক্ষা করা হয়। সেটি প্রথম দিনেই করা যায়।

ফল পজিটিভ হলেই কি ডেঙ্গু?

যদি প্রথমবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে এটির রেজাল্ট ৯০ ভাগ পর্যন্ত সঠিক হতে পারে, মানে পজিটিভ হলে নিশ্চিত ডেঙ্গু কারো ক্ষেত্রে এটি নেগেটিভ হতে পারে প্রথম দিকে, তবে তার মানে এই নয় যে তার ডেঙ্গু হয়নি। কারণ জীবনের কোনো সময় যদি ডেঙ্গু হয়ে থাকে, তাহলে এটি ৬০ ভাগ পর্যন্ত সঠিক ফলাফল দেখায়, মানে নেগেটিভ হলেও বলা নাও যেতে পারে ডেঙ্গু হয়নি।

সে ক্ষেত্রে আরেকটি পরীক্ষা করা লাগে আইজিএম অ্যান্ড আইজিজি। আইজিএম সাধারণত দুই মাস পর্যন্ত পজিটিভ থাকতে পারে। আর আইজিজি থাকতে পারে সারা জীবন। এই দুটির মধ্যে অনুপাত করে বোঝা যায়, রোগী কি প্রাথমিক না দ্বিতীয়বার আক্রান্ত।

সবার কি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগে?

এক কথায় উত্তর, না। রক্তের সিবিসি রিপোর্ট দেখে এবং লক্ষণ দেখে চিকিৎসক বুঝতে পারেন কাকে ভর্তি দেওয়া প্রয়োজন আবার কাকে নয়। ডেঙ্গু যেহেতু বলতে গেলে আমাদের সবারই হয়েছে কোনো না কোনো এক সময়ে, তাই যে টাইপের ভাইরাস দিয়ে হয়েছে তার বিরুদ্ধে শরীর শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে। নতুন ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হলেই সেটি দিয়ে বিপদ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

যেসব লক্ষণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া জরুরি কিছু লক্ষণ রয়েছে, যেমন–

- অস্বাভাবিক বমি হওয়া
- পেটে পানি আসা
- প্রেশার কমে যাওয়া
- অচেতন ভাব হওয়া, ইত্যাদি।

এর বাইরে জ্বর হলেই যে ভর্তি হওয়া লাগবে, তা নয়। পর্যাপ্ত পানি পান করা (পারলে স্বাভাবিকের চেয়ে ১ লিটার বেশি পান করা), দেশি ফল খাওয়া, বিপদের লক্ষণগুলো খেয়াল রাখা ইত্যাদি বজায় রাখতে পারলেই বিপদ এড়ানো সম্ভব। উপচে পড়া রোগীর ভিড়ে এখন দেখা যাচ্ছে যাদের জীবন-মরণ সমস্যা তাদেরকেই ভর্তি করানো যাচ্ছে না। সবাই আরেকটু সচেতন হলেই সম্ভব এই আউটব্রেক মোকাবিলা করা।

• **লেখক**, *ডা. আশরাফুল হক, মেডিক্যাল অফিসার, এমআইএস, ডিজিএইচএস*

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে করণীয়

ঝোপঝাড়

টায়ার/ চৌবাচ্চায় জমে থাকা পানি

ডাবের খোসায় জমে থাকা পানি

বারান্দার ফুলের টবে জমে থাকা পানি

বাসার ছাদে জমে থাকা পানি

নালার ময়লা আবর্জনাযুক্ত পানি

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধের মূল মন্ত্রই হলো এডিস মশার বিস্তার রোধ এবং এই মশা যেন কামড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে, এডিস একটি ভদ্র মশা, অভিজাত এলাকায়, বড় বড়, সুন্দর সুন্দর দালানকোঠায় এরা বসবাস করে। স্বচ্ছ পরিষ্কার পানিতে এরা ডিম পাড়ে।

ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত ড্রেনের পানি এদের পছন্দসই নয়। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার ডিম পাড়ার উপযোগী স্থানগুলোকে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে মশা নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে করণীয়

- বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গল, জলাশয় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- যেহেতু এডিস মশা মূলত এমন বস্তুর মধ্যে ডিম পাড়ে, যেখানে স্বচ্ছ পানি জমে থাকে। তাই ফুলদানি, ফুলের টব, অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোলা, পরিত্যক্ত টায়ার ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ঘরের বাথরুম, বাথটাব, কমোড বা কোথাও জমানো পানি পাঁচ দিনের বেশি যেন না থাকে। অ্যাকুয়ারিয়াম, ফ্রিজ বা এয়ারকন্ডিশনারের নিচেও যেন পানি জমে না থাকে।
- বেইজমেন্টের পানির ট্যাংক, চৌবাচ্চা, ওয়াসার পানির মিটার, অব্যবহৃত বালতি, পানির ড্রাম পরিষ্কার রাখতে হবে।
- বাড়ির ছাদ, উঠান ও দুই দালানের মাঝে পানি জমতে দেয়া যাবে না।
- এডিস মশা সাধারণত সকালে ও সন্ধ্যায় কামড়ায়। তবে অন্য কোনো সময়ও কামড়াতে পারে। তাই দিনের বেলা শরীরে ভালোভাবে কাপড় ঢেকে বের হতে হবে, প্রয়োজনে মসকুইটো রিপেলেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের দরজা-জানালায় নেট লাগাতে হবে।
- দিনের বেলায় মশারি টাঙিয়ে অথবা কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমাতে হবে।
- বাচ্চাদের যারা স্কুলে যায়, তাদের হাফ প্যান্ট না পরিয়ে ফুল প্যান্ট পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে।
- মশা নিধনের স্প্রে, কয়েল, ম্যাট ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য দিনে ও রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে।
- ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সব সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, যাতে করে কোনো মশা কামড়াতে না পারে।

ডেঙ্গু জ্বরের মশাটি এ দেশে আগেও ছিল, এখনো আছে, মশা প্রজননের এবং বংশবৃদ্ধির পরিবেশও আছে। তাই একমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সচেতনতা ও প্রতিরোধের মাধ্যমেই এর হাত থেকে বাঁচা সম্ভব।

মোবাইলেই মিলবে রক্তের খোঁজ

ইনফোব্লাড
ডাউনলোড লিংক:
https://urlzs.com/zrEti

রক্তবন্ধু.কম
ডাউনলোড লিংক:
https://urlzs.com/26VSg

ব্লাড বট
পেইজ:
facebook.com/bloodbot/

ছারপোকা অ্যাপ
ডাউনলোড লিংক:
http://bit.ly/2SP07PU

ফেসবুক
পেইজ:
facebook.com/donateblood

জীবনের জন্য রক্ত
পেইজ:
facebook.com/jibonerjonnorokto